সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ সন্ধান ও প্রাপ্তি

অশোককুমার রায়

রবীন্দ্র - উত্তর বাংলা রস সাহিত্য .... একটু বিস্তৃত করে বলতে গেলে সমগ্র বাংলাকে আলোড়িত ....আলোকিত করে গেছেন অপরাজেয় রসসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী। রস রচনার ক্ষেত্রে নির্মল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস পরিবেশনে তাঁর তুলনা একমাত্রতাঁর সঙ্গেই করা চলে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে ও বাঙালী পাঠক হৃদয়ে মুজতবা আলীর স্থান উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া দু'জন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন তাঁদের একজন হলেন প্রমথনাথ বিশী ও অন্যজন সৈয়দ মুজতবা আলী। দু'জনেই শান্তিনিকেতনের প্রাথমিক পর্বে পড়াশোনা করতে এসেছিলেন অন্তরের তাগিদে। প্রমথনাথ এসেছিলেন রাজসাহী থেকে, আর সৈয়দ মুজতবা আলী এসেছিলেন শ্রহট্ট থেকে। মফঃস্বল থেকে আসা এই দুই ছাত্রের জীবনে উভয়েই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছেন। প্রমথনাথ গল্প উপন্যাস কবিতা - নাটক, প্রবন্ধ রম্যরচনা প্রভৃতি সাহিত্যের নানা শাখাতে বিচরণ করেছেন। মুজতবা আলী দু' তিনটি উপন্যাস রচনা করলেও প্রধানতঃ বৈচিত্রধর্মী রমরচনাও গল্প লেখাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ শহরে সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলী ও মায়ের নাম আয়তুল মান্নান খাতুন। সুনাম গঞ্জ শহরের এক পাঠশালায় মুজতবা আলীর পাঠ্য জীবনের সূচনা হয়। এরপর তিনি মোলভিবাজার সরকারী হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে তাঁর পিতা সিলেট শহরে বদলী হলে মুজতবা আলী ভর্তি হলেন সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে।

ছাত্র জীবনেই মুজতবা আলীর সাহিত্য প্রীতির উন্মেষ ঘটে। অগ্রজ সৈয়দ মূর্তাজা আলীর সঙ্গে মুজতবা আলী কুইনিন নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া বড় দাদা সৈয়দ মোস্তাফা আলী ছিলেন তাঁদের সাহিত্যপ্রীতির উৎস। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাস নাইনের ছাত্র মুজতবা আলী গান্ধীজীর ডাকে যোগ দেন অসহযোগ আন্দোলনে। আর এই ছাত্র জীবনেই পাওয়া যাবে তাঁর অনমনীয় দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। যার জন্য সরকারী চাকুরীয়া পিতাকে বিব্রত হতে হয়েছে। সিলেট শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা হয়েছে ঢাকা দক্ষিণের কাজী সাহেবের কাছে। এখানে তিনি প্রতিদিন মোজা বুনে দেড় থেকে দু'টাকা উপার্জন করেছেন। কিন্তু এ'কাজে তাঁর মন বসেনি। দু'তিন মাসের মধ্যেই তিনি এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন।

সিলেট থাকাকালীন মুজতবা আলী এক ছাত্র সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। বক্তৃতার বিষয় ছিল আকাঙ্খা। এসময় তিনি কবির সঙ্গে পত্রালাপ করেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে পরিবারের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আর মুজতবা আলীও চঞ্চল হয়ে ওঠেন শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করবার জন্য। সেই আশা ফলবতী হল। মুজতবা আলী প্রথমে ভর্তি হলেন পাঠ ভবনে (স্কুল বিভাগে)। এর পরে যোগ দিয়েছেন বিশ্বভারতী কলেজ বিভাগে। আর সেখানে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছেন অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬ - ১৯৭৬), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১ - ১৯৮৫), অনাথনাথ বসু (১৯০০ - ১৯৬১) কে। তাঁর সময়ে কলাভবনে ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭ - ১৯৭৬), অনাদিকুমার দস্তিদার (১৯০৩ ১৯৭৪), হরিপদ রায় (১৮৯৫ - ১৯৭৬), হরিপদ রায়(১৮৯৫ - ১৯৭১), মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৫ - ১৯৬৮), বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪ - ১৯৮০), সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৭ - ১৯৮০) প্রমুখ। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন (১৯২১ - ১৯২৬) তাঁর শিক্ষাকে শুধু বহুমুখীই করেনি, বিবিধ জিজ্ঞাসায় ব্যাপ্ত করেছিল। ১৯২১ সালে মুজতবা যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, বিশ্বভারতীর তখনও কলেজ বিভাগ খোলা হয়নি। তাঁর পৌঁছানোর ছ'মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪ - ১৯৩৮) - এর পৌরহিত্যে তার ভিত্তি স্থাপন হয়। এই প্রসঙ্গে মুজতবা লিখেছেন, "বিশ্বভারতীতে তখন জন দশেক ছাত্র - ছাত্রী ছিলেন, তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজ বিভাগেঢুকেছেন--- শ্রীহট্টবাসী রূপে আমার গর্ব এই যে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র। এই বাইরের ছাত্রটি কিন্তু অবিলম্বে ভিতরের মানুষ হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে পড়েন শেলি, কিটস আর বলাকা। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পঠন পাঠনের মধ্যে বিদ্যাভবনে নতুন ধারার সূত্রপাত হলো। বগ্‌দানোফ নামে এক শ পণ্ডিত এসে এর সূত্রপাত করলেন। তিনি একই সঙ্গে পার্শিএবং ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইংরেজি আর আরবীতেও দুরস্ত। এসেই তিনি বিশ্বভারতীতে ইসলামিক সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করলেন। জিয়াউদ্দিন, মুজতবা আলী প্রমুখেরা তাঁর ছাত্র হলেন। ধীরে ধীরে অনেক কিছু শেখার, শেখানোর জন্য আসেন একদা সুইস - ফরাসী শিক্ষক ফার্দিনন্দ বেনোয়া। ১৯২৭ সালে তিনি আশ্রম ত্যাগ করে কাবুলে কাজ নিয়ে চলে যান। এই সময় মুজতবা আলীও কাবুলে চলে যান।

একাদিক্রমে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে মুজতবা আলী বিশ্বভারতীর স্নাতক হন। তিনি ও বাচুভাই ছিলেন এখানের প্রথমবারেরস্নাতক। মুজতবার ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন তো কোন আলাদা সত্তা ছিল না। তারই মত প্রাণের অজস্র প্রাচুর্য তখনসেখানে। ওইরকম একটা খুশি, ওই রকম একটা জীবনায়নের পরিবেশই ছিল তখনকার শান্তিনিকেতনে। কতো মহানুভব মনীষীর সংস্পর্শে এসেছেন তিনি তাঁর মহৎ যৌবনের সূচনায়। সিলভাঁ লেভি, তুচ্ছি , উইনটারনিজ, কলিনস্, লেজনি, বেনোয়া, বগদানোফ, ষ্টেনকোনো প্রভৃতি বিদেশী গুণীজনের সঙ্গে বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, নন্দলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ প্রভৃতিদেরও সান্নিধ্য ও নানা বিষয়ে আলোচনা তথা জ্ঞান আহরণ, অন্যদিকে নাটকে, গানে, নাচে এক ঋদ্ধ পরিমণ্ডলে বাসেরঅসের সমৃদ্ধ আয়োজন। মুজতবার জীবনে রবীন্দ্রনাথের মতোই শান্তিনিকেতন প্রাণরসের অজস্র উৎস এক অনিবার্য অধিষ্ঠান।

বিশ্বভারতীতেই তিনি শিখেছিলেন একই সঙ্গে ফার্সী আর ফরাসী। আরও শিখে ছিলেন জার্মান। একমাত্র বিশ্বভারতীতেই তখন এই সুযোগ ছিল। আর তারই সুবাদে শিক্ষাবিভাগের অধীনে অধ্যাপনার চাকরি। কাবুল থেকে হুমবল্ট বৃত্তিলাভ করে পাড়ি দেন সুদূর জার্মানির আর্লীনে। আর্লীন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা টার্ম (১৯২৯ - ১৯৩০) অধ্যয়নের পর তাঁর জ্ঞানযোগের জায়গাটি বদল হয়। আর্লীন থেকে বন। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর পড়াশুনো করে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর

অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ছিল ঃ "The Origin of the khojas and their religious life to – day" । এর পর দেশে ফিরে কলকাতায় ও মৌলবি বাজারে বাস (১৯৩৩)। এই সময়ে শিলঙে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করে বিদ্বৎজন সমাজে প্রশংসিত হন। ১৯৩৪ সালে রেডিওলজিষ্ট ডাক্তার অজিত বসুর সঙ্গে দোভাষী হিসেবে ইয়োরোপ ভ্রমণ করে ফেরার পথে কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এক স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমে (১৯৩৪ - ৩৫) যোগদিয়ে সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেন। বরদার মহারাজার আহ্বানে ভারতে ফিরে বরোদায় অধ্যাপনা (১৯৩৫ - ১৯৪৪) করেন। ১৯৪৪ সালে শেষে বরোদার চাকরি ছেড়ে জার্মানী বেড়াতে যান এবং ১৯৪৫ সালে দেশে ফিরে এসে সর্বক্ষণের সাহিত্য জীবন শু করেন। দেশ পত্রিকার সত্যপীরের ধারাবাহিক প্রকাশ (১৯৪৫ - ১৯৪৭) 'দেশে - বিদেশে (১৩ মার্চ, ১৯৪৮) ঃ প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ। মূল রচনাটি 'দেশ' পত্রিরকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে জ ানুয়ারি মাসে পূর্বপাকিস্তানের বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দক্ষতা এবং সুনাম অর্জন করলেও তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরক ারের রোষে পড়ায় অধ্যক্ষ পদ থেকে অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে ১০ মাসের মধ্যেই অব্যাহতি। ঐ বছরই 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের জন্য দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপক পদে যোগ দিলেও মে মাসেই মাত্র চার মাস পড়িয়ে ইস্তফা পত্র জমা দিয়ে দিল্লীতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ কালচারাল রিলেসন এর সেক্রেটারী পদে যোগ দেন। এই সময়ে দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'তাকফাৎ - উল - হিন্দ' নামে আরবী পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ ঢাকার রাবেয়া কাতুনের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি থেকে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রায় পিথৌরা' (সপ্তপর্ণী কলামের সূচনা), 'গোলাম মৌলা' ছদ্মনামেও লিখতেন। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে নয়া দিল্লী বেতার কেন্দ্রের ষ্টেশন ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। ক্রমে কলকাতা, কটক ও পাটনা বেতার কেন্দ্রেরও ষ্টেশণ ডিরেক্টরের পদেও সম্পাদনা করেন। সব কাজের মত আন্তরিক প্রয়াস থাকলেও স্বাধীনচেতা মুজতবার লিসনার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অল্পকালের মধ্যেই মতানৈক্য ঘটে। ১৯৫৮ সালে পুনরায় ইংলণ্ড ভ্রমণ করেন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে। সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্য ালয়, বি.বি.সি., আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ ও ব্রিটিশ - ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন - এর সমাবেশে ভাষণ দেন। ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে বিশ্বভারতীতে ইসল ামী সংস্কৃতির বিভাগীয় প্রধান ও জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক সুরেশচন্দ্র মজুমদার' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ সালের (৭ই পৌষ১৩৬৯) শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে আচার্য রূপে মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করেন। ১৯৬৫ সালের জুম ম াসে ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু বিস্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণ করেন মুজতবা আলী। অবসর গ্রহণের পর প্রথমে শান্তিনিকেতনে, এবং পরে কলকাতায় বাস কালে সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত থাকেন। ১৯৭০ সালে শেষ বারের মত জার্মানির বন, কোলন, ডুসেলডর্ফ, হামবুর্গ, ষ্টুটগার্ট প্রভৃতি শহর ভ্রমণকরেন। এই সময়ে তিনি হিটলারের জীবন দর্শন ও কর্মধারা নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে শু করলেও শারীরিক কারণে অর্ধসমাপ্ত রেখেই কলকাতায় ফেরেন। ১৯৭৩ সালে কলকাতায় এক সন্ধ্যায় পক্ষঘাতে আক্রান্ত হন। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে ঢাকায় চলে যানঃ ১৩ই ডিসেম্বর। সেখানে তখন তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র ছিলেন।

১৯৭৪ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা বেজে ৫০ মিনিটে ঢাকা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতালে মুজতবা আলী পরলোক গমন করেন। ঐ দিনে সন্ধ্যায় বায়তুল মে াকাররমে জানাজা পড়ার পর রাত আটটায় আজিমপুর গোরস্থানে মুজতবা আলীকে সমাহিত করা হয়।

বাংলা সাহিত্যে রম্য প্রবন্ধ লেখার সূত্রপাত বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' -এর মধ্যে দিয়ে এক নতুন মাত্রা দান করলেন প্রবন্ধ সা হিত্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধের ব্যাপ্তি এনে দিলেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল । এই সব ধারার মধ্যে মুজতবা আলী এক নতুন আস্বাদ নিয়ে এলেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের হৃদয় তিনি জয় করে নিলেন (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৪৬।। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, উৎসর্গ জিন্নতবাসিনী জাহানারা - কে) । তার একে একে আষাঢ়, ১৩৫৯।। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাত া, উৎসর্গ সরলাবালা সরকারকে। 'পঞ্চতন্ত্র' (২য় পর্ব) প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৭৩।। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, উৎসর্গ ডক্টর রণজিৎ রায়কে। 'চাকা - কা হিনী' প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৫৯।। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা, উৎসর্গ সহধর্মিনী রাবেয়া আলীকে।। 'ময়ুরকণ্ঠী', প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৫৯।। বেঙ্গল প াবলিশার্স , কলিকাতা, উৎসর্গ প্রথমনাথ বিশীকে।। 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৬৩ শ্র১৯৪৭ সালের ৩০শে নভেম্বর মুজতবা আলী সিলেটে মুসলিম সাহিত্য সংসদে এই সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, গ্রন্থটি তা'রই সঙ্কলন)। 'জলে ডাঙ্গায়', প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৬২।। বেঙ্গল পাবলিশার্স কলিকাতা, উৎসর্গ পুত্র সৈয়দ মশরফ আলীকে।। 'ধূপছায়া', প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৬৪।। ত্রিবেণী প্রকাশনা, কলিকাতা, উৎসর্গ মেজভাই সৈয়দ মুর্তজা আলীকে।। 'দ্বন্দ - মধুর', প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৬৫।। গ্রন্থটি রঞ্জন-এর (সাহিত্যিক নিরঞ্জন মজুমদার) সঙ্গে যৌথ ভাবে রচিত।। 'বড়বাবু', প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৭২।। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, উৎসর্গ সুধীন দত্ত ও নীলিমা দত্তকে।। 'কত না অশ্রুজল', প্রথম প্রকাশ নববর্ষ, ১৩৭২।। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, উৎসর্গ শ্রীমান ফণী দেব ও শ্রীমান সাগরময় ঘোষের করকমলে।। 'হিটলাক', প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা, ১৩৭৭।। বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলিকাতা, উৎসর্গ শ্রীমতী অর্চনা ও শ্রীমান দ্বারিক মিত্রকে।। 'চতুরঙ্গ', প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৬৭।। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা।। 'শবনম', প্রথম প্রকাশ রাখী পুর্ণিমা, ১৩৬৭।। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।। 'শবনম', প্রথম প্রকাশ রাখী পুর্ণিমা, ১৩৭৬।। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, উৎসর্গ রাজশেখর বসুকে।। 'টুনিমেম', প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৭৬।। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। উৎসর্গ গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে।। 'প্রেম' (অনাবাদ) প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৩৭২।। আনন্দ পাবলিশার্স কলিকাতা, উৎসর্গ অবধূতকে।। 'দূহারা' (রম্যরচনা সংকলন) প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৭২।। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, উৎসর্গ পুত্র সৈয়দ জগলুল আলীকে।। 'হাস্যমধুর', প্রথম প্রকাশ আগ্রহায়ণ, ১৩৭৩।। গ্রন্থ প্রকাশ, কলিকাতা, উৎসর্গ আবু সয়ীধ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুব দত্তকে।। 'পছন্দসই', প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১০৭৪।। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। 'তুলনাহীনা', প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৭৪।। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।। 'তুলনাহীনা', প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৭৪ (১৩৮১) বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, উৎসর্গ 'ভাগনেয় ওয়ালী'কে।। 'শহর - ইয়ার' প্রথম প্রকাশ আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, উৎসর্গ পশুপতি খানকে। 'মুশাফির', প্রথম প্রকাশ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, উৎসর্গ 'রাবেয়া, ফিরে াজ ও কবীর'কে (জীবিত কালে প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ)।। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮।। বাক সাহিত্য, কলিকাতা, উৎসর্গ রাধারাণী মুখোপাধ্যায়কে। ।। 'ভবঘুরে ও অন্যান্য', প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮।। বাক সাহিত্য, কলিকাতা, উৎসর্গ কৃষ্ণা হাতীসিংকে।। 'বহুবিচিত্রা', প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৬৯।। গ্রন্থ প্রকাশ কলিকাতা, উৎসর্গ কানাইলাল সরকার, পুলিনবিহারী সেন ও সাগরময় ঘোষকে।। 'শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা', প্রথম প্রকাশ ১৩৮২।। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।। 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়', প্রথম প্রকাশ ১৩৮২।। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।। 'বিদেশে', (১৯৭১ সালে দেশ পত্রিকায় 'পঞ্চতন্ত্র' নামে প্রকাশিত হলেও কখনো গ্রন্থবদ্ধ না হওয়া রচনাগুলির সংকলন মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে)।। 'বাংলাদেশ ও উভয় বাংলা' (১৩৮৪) ('পঞ্চতন্ত্র' শিরোনামে ১৯৭২ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি কখনো। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে পুণমুদ্রিত হয়েছে)।।

সৈয়দ মুজতবা আলীর সমগ্র প্রকাশিত - অপ্রকাশিত রচনা, চিঠিপত্র, ডায়েরী প্রভৃতি যাবতীয় লেখা নিয়ে মোট এগারো খণ্ডে সমাপ্ত রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা থেকে যথাক্রমে ১ম খণ্ড (ভাদ্র ১৩৮৯) (মুজতবা আলীর জীবনী-- লিখেছেন সৈয়দ মুর্তাজা আলী। ভূমিকা— প্রমথনাথ বিশী। সূচী ঃ পঞ্চন্ত্র (১ম পর্ব), ময়ুরকণ্ঠী, দ্বন্দ্ব - মধুর) পৃষ্টি ৪৩২।। দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৮১) (ভূমিকা গৌরকিশোর ঘোষ। সূচী ঃ ধূপছায়া, পঞ্চতন্ত্র (দ্বিতীয় পর্ব), ও চতুরঙ্গ) পৃষ্ঠা ৪৬৪।। তিতিয় খণ্ড (১৩৮৯) (ভূমিকা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুচী ঃ টুনিমেম, রাজা উজীর, প্রেম) পৃষ্টা ৪৯৩।। চতুর্থ খণ্ড (১৩৮২) (ভূমিকা পরিমল গোস্বামী।

সূচী ঃ বড়বাবু, কত না অশ্রুজল, হিটলার) পৃষ্ঠা ৪১৯।। পঞ্চম খণ্ড (১৩৮২) (ভূমিকা সৈয়দ আলী আহসান। সূচী ঃ আব্বিাস্য, শবনম, দুবহারা) পৃষ্ঠা ৪৮৭।। ষষ্ঠ খণ্ড (বৈশাখ, ১৩৮৩) (ভূমিকা অণ মুখোপাধ্যায়। সূচী ঃ তুলনাহীনা, শহর - ইয়ার) পৃষ্ঠা ৩৮৫।। সপ্তম খণ্ড (আশ্বিন, ১৩৮০) (ভূমিকা অণ বসু। সূচী ঃ জলে ডাঙায়, ভবঘুরে ও অন্যান্য, মুশারিফ) পৃষ্ঠা ৪১১।। অষ্টম খণ্ড (আশ্বিন, ১৩৮৪) (ভূমিকা সবিতেন্দ্রনাথ রায়। সূচী ঃ পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, বিদেশে, বাংলাদেশ ও উভয় বাংলা) পৃষ্ঠা ৪৩০।। ১০ম খণ্ড (আশ্বিন, ১৩৮৪) (ভূমিকা গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সূচী পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, বিদেশে, বাংলাদেশ ও উভয় দেশ - শেষাংশ) পৃষ্ঠা ৪১৫।। ১১শ খণ্ড (১৩৯৬) (চিঠিপত্র, বিবিধ)।।

মুজতবা আলীর রচনায় সবচেয়ে যে বড় বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তা'হল বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে সরল মানসিকতার এক আশ্চর্য সমন্বয়। সাধারণতঃ আমরা অনেক লেখাপড়া জানা পণ্ডিতদের গুগম্ভীর চালে প্রবন্ধ লেখা দেখতেই অভ্যস্ত। সে ক্ষেত্রে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত মুজতবা আলীর রচনায় হালকা চালে যে কত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তা আমাদের বিস্মিত করে। কর্মসূত্রে লেখককে বিদেশের বহুস্থানে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর রচনার কাজে ব্যবহার করেছেন--- প্রচলিত অর্থে ভ্রমণকাহিনী রচনা করে নয়, সেই ভ্রমণের নির্যাসটুকু বিচিত্রভাবে পরিবেশন করে।

যে আশ্চর্য জীবনবোধ হিউমার (Humour) এর বিষয়বস্তু, তা' পুরোমাত্রায় মুজতবা আলীর মধ্যে ছিল। জীবনকে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে দেখেছেন--- জীবনরসের রসিকের দৃষ্টিতে। তাঁর রচনায় কোথাও নেই আক্রমণের তীব্রতা বা বিদ্বেষের আগুন। ফলে তাঁর রম্যরচনাগুলি দেশ - কাল - জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছেই হয়ে উঠেছে রমনীয়।

চরিত্র চিত্রণে মুজতবা আলীর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। কলমের স্বল্প কয়েকটি আঁচড়ে তিনি এক একটি চরিত্রকে এমন ভাবে জীবন্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে তার তুলনা হয় না। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির বেশির ভাগই আমাদের চেনা - জানা, কিন্তু এর আগে আমরা তাদের মুখে আলো ফেলে এত স্পষ্ট ভাবে দেখিনি। অজস্র দেশী - বিদেশী ছোট - ছোট চরিত্রের মিছিলেতাঁর লেখা ভরপুর।

সর্বোপরি, মুজতবা আলীর লেখার অন্যতম আকর্ষণ হল তাঁর ভাষা। চলিত গদ্যরীতির এমন দুর্দান্ত ব্যবহার খুবই দুঃসাহসিক। দেশী বিদেশী যে কোন শব্দকে তিনি অনায়াসে ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখায়--- কথায় যা দুর্লভ। তাঁর রচনা পড়তে পড়তে বহুভাষার শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর একটি বাড়তি লাভ। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাসাহিত্যে মুজতবা আলীর জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com